শিক্ষাঙ্গন থেকে শুরু হোক সবুজ বিপ্লব

সুমনা গুপ্তা

‘পৃথিবী আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া নয়; বরং আমাদের সন্তানদের কাছ থেকে ধার নেওয়া’– বহুল উদ্ধৃত এই কথাটি আজ আর নিছক প্রবচন নয়, বরং জলবায়ু সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা একটি সভ্যতার আত্মজিজ্ঞাসা। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, জীববৈচিত্র্যের নিঃশব্দ বিলুপ্তি, নদী-খাল-বনভূমির ধ্বংস, বায়ু ও পানির দূষণ, প্লাস্টিকের অবিরাম আগ্রাসন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের নির্বিচার ভোগ– এসব মিলিয়ে মানবসভ্যতা আজ এমন এক মোড়ে দাঁড়িয়ে, যেখান থেকে ফেরার পথ ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছে। প্রযুক্তি, আইন কিংবা আন্তর্জাতিক চুক্তি– এসবের ভূমিকা অস্বীকারের উপায় নেই, কিন্তু তার চেয়েও জরুরি একটি প্রশ্ন থেকে যায় : আমরা কি এমন একটি প্রজন্ম গড়ে তুলতে পারছি, যারা প্রকৃতিকে শুধু পাঠ্যবইয়ের অধ্যায় নয়, নিজের অস্তিত্বের অংশ বলে অনুভব করবে? এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে শিক্ষায়– আর শুধু শিক্ষায় নয়, শিক্ষার দর্শনে।

আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সংকট এখানেই– পরিবেশবিজ্ঞান পাঠ্যক্রমে আছে, কিন্তু তা মূলত মুখস্থবিদ্যা আর নম্বরের হিসেবে বন্দি। একজন শিক্ষার্থী ‘গ্রিনহাউস গ্যাস’ কী তা মুখস্থ বলে দিতে পারে, অথচ নিজের এলাকার একটি গাছ কাটা পড়লে তার প্রতিবাদ করার মতো সংবেদনশীলতা তার মধ্যে গড়ে ওঠে না। জ্ঞান আর অনুভূতির এই বিচ্ছিন্নতাই আজকের শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য কেবল তথ্য সরবরাহ নয়– তা মানুষের চিন্তা, মূল্যবোধ ও আচরণের ভিত্তি গড়ে তোলা। ছোটবেলায় অর্জিত অভ্যাস– গাছ লাগানো, পানির অপচয় রোধ, বিদ্যুৎ সাশ্রয়, প্লাস্টিক পরিহার, বর্জ্য পৃথকীকরণ– এসব যদি জীবনের প্রথম দিকেই রপ্ত হয়, তবে তা সারাজীবনের সঙ্গী হয়ে থাকে। গবেষণাও এই সত্যকে সমর্থন করে : শৈশবে গড়ে ওঠা পরিবেশসচেতনতা প্রাপ্তবয়সে নাগরিক দায়িত্ববোধ হিসেবে প্রকাশ পায়।

এই আলোচনা বাংলাদেশের জন্য নিছক তাত্ত্বিক নয়, বরং অস্তিত্বের প্রশ্ন। বিশ্বের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান সবার ওপরের সারিতে। উপকূলীয় অঞ্চলে বাড়ছে লবণাক্ততা, নদীভাঙনে প্রতিবছর হারিয়ে যাচ্ছে হাজারো মানুষের ভিটেমাটি, আকস্মিক বন্যা আর ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বাড়ছে, খরা আর দীর্ঘস্থায়ী তাপপ্রবাহ কৃষি ও জনস্বাস্থ্যকে সরাসরি আঘাত করছে। এই বাস্তবতায় শিশুদের শুধু জলবায়ু পরিবর্তনের সংজ্ঞা মুখস্থ করানো যথেষ্ট নয়– তাদের জানতে হবে এর কারণ, প্রভাব এবং সম্ভাব্য প্রতিকার সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক, প্রায়োগিক জ্ঞান। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO) এবং জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (UNESCO) বহুদিন ধরেই ‘টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা’ (Education for Sustainable Development) নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়ে আসছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির গতি চরম

> আজকের শ্রেণিকক্ষে বসে থাকা শিশুটিই আগামী দিনের নীতিনির্ধারক, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী কিংবা রাষ্ট্রনায়ক। তার শিক্ষা যদি প্রকৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আর মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, তবেই গড়ে উঠবে এক সবুজ, নিরাপদ ও বাসযোগ্য

স্থানীয় নদী বা বনভূমি পরিদর্শন এবং বিজ্ঞানভিত্তিক পরিবেশ প্রকল্প– এসব শিক্ষার্থীদের বইয়ের বাইরে বাস্তব অভিজ্ঞতার দরজা খুলে দিতে পারে। যেমন ধরা যাক, দেশের কোনো কোনো গ্রামীণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা এখন নিজেরাই রান্নাঘরের সবজির খোসা আর পাতা দিয়ে জৈব সার তৈরি করে স্কুল-বাগানে ব্যবহার করছে– এতে একদিকে যেমন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শেখা হচ্ছে, তেমনি ফলানো সবজি মিড-ডে মিলেও কাজে লাগছে। আবার উপকূলীয় এলাকার কিছু বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়ে ‘বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ’ প্রকল্প চালু হয়েছে, যেখানে তারা নিজেরাই মাপজোখ করে দেখছে কীভাবে একটি ছাদের বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করলে খরার মৌসুমে তা কাজে লাগানো যায়। এই ধরনের ছোট ছোট বাস্তব উদ্যোগই শিশুর মনে দীর্ঘস্থায়ী পরিবেশচেতনা গেঁথে দেয়, যা কোনো পরীক্ষার নম্বর দিতে পারে না। ভাবুন তো, যদি একটি বিদ্যালয় একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করে, সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার বাড়ায়, বর্জ্য পৃথকীকরণের কাঠামো গড়ে তোলে এবং প্রাঙ্গণজুড়ে সবুজায়ন নিশ্চিত করে– তাহলে সেই বিদ্যালয়ের

প্রতিটি শিক্ষার্থী প্রতিদিনই বাস্তব পরিবেশ শিক্ষা লাভ করবে। বিশ্বের বহু দেশ ইতোমধ্যে ‘গ্রিন স্কুল’ ধারণা সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে; বাংলাদেশেও এখন এই উদ্যোগ সময়ের অনিবার্য দাবি। তবে শুধু কাঠামো বদলালেই হবে না– এর প্রাণ সঞ্চার করতে হবে মানুষকেই। একজন শিক্ষক কেবল পাঠদানকারী নন; তিনি শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ গঠনের এক নীরব স্থপতি। একইভাবে অভিভাবকদেরও এই দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। বিদ্যালয়ে শেখানো পরিবেশসচেতনতা যদি ঘরে ফিরে পানি-বিদ্যুতের অপচয়, অতিরিক্ত প্লাস্টিক ব্যবহার কিংবা প্রকৃতির প্রতি উদাসীনতার মুখোমুখি হয়, তাহলে শিশুর মনে তৈরি হয় এক বিভ্রান্তিকর দ্বৈত বার্তা। তাই পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজ– এই তিন স্তম্ভের সমন্বিত প্রয়াস ছাড়া কোনো পরিবর্তনই টেকসই হবে না।

পর্দার আলোয় গাছ দেখা আর বাস্তবে গাছের ছায়ায় বসা– এই দুইয়ের মধ্যে ফারাকটুকু ভুলে গেলে চলবে না।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলোর (SDGs) মধ্যে মানসম্মত শিক্ষা, জলবায়ু কার্যক্রম, স্থলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই নগরায়ণ– এই সবগুলোরই সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে পরিবেশ শিক্ষার সঙ্গে। বাংলাদেশও এই লক্ষ্য অর্জনে আন্তর্জাতিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। এখন প্রয়োজন কেবল কাগুজে নীতি নয়, বরং তার কার্যকর মাঠপর্যায়ের বাস্তবায়ন– শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ব্যবহারিক মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশভিত্তিক কার্যক্রমকে নিয়মিত চর্চায় রূপান্তরিত করা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু আগেই প্রকৃতিকে শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখেছিলেন। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাদর্শনের মূল কথাই ছিল– মুক্ত প্রকৃতির সান্নিধ্যে, খোলা আকাশের নিচে মানুষ গড়ে তোলা। শ্রেণিকক্ষের চার দেয়ালের বাইরে গাছের ছায়ায় বসে পাঠ নেওয়া তার কাছে ছিল শিক্ষার সবচেয়ে স্বাভাবিক রূপ। জলবায়ু সংকটের এই সংকটকালে সেই শতবর্ষ পুরনো দর্শন যেন নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে– আমাদের আবার শিখতে হচ্ছে, প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়, প্রকৃতির সঙ্গে মিলেই এগোতে হবে।

শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবেশ ও প্রকৃতি শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার অর্থ শুধু একটি চারাগাছ রোপণ করা নয়– তার চেয়েও গভীর একটি লক্ষ্য এতে নিহিত : এমন একটি প্রজন্ম গড়ে তোলা, যারা উন্নয়ন আর প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে জানবে, যারা লাভ আর টেকসইতার মধ্যে সঠিক পথ বেছে নিতে পারবে। আজকের শ্রেণিকক্ষে বসে থাকা শিশুটিই আগামী দিনের নীতিনির্ধারক, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী কিংবা রাষ্ট্রনায়ক। তার শিক্ষা যদি প্রকৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আর মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, তবেই গড়ে উঠবে এক সবুজ, নিরাপদ ও বাসযোগ্য বাংলাদেশ– যা কেবল

আবহাওয়ার ঘন ঘন প্রকোপ আর জীববৈচিত্র্যের ক্ষয় আজ আর দূরের কোনো আশঙ্কা নয়– তা আমাদের দৈনন্দিন বাস্তবতা। প্রশ্ন হলো– কীভাবে বদলাবে এই চিত্র? উত্তরটি খুব জটিল নয়, বরং হাতের নাগালে। একটি বিদ্যালয় নিজেই হয়ে উঠতে পারে পরিবেশ শিক্ষার জীবন্ত পাঠশালা। নিয়মিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, সক্রিয় পরিবেশ ক্লাব, ক্যাম্পাস পরিচ্ছন্নতা অভিযান, ছোট্ট স্কুল-বাগান, বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের অনুশীলন,

আধুনিক প্রযুক্তিও এই যাত্রায় নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। স্যাটেলাইট চিত্র, ভার্চুয়াল ল্যাবরেটরি, ডিজিটাল শিক্ষাসামগ্রী এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক শিক্ষামাধ্যম শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞানকে আরও গভীর ও প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে। তবে সতর্ক থাকতে হবে একটি জায়গায়– প্রযুক্তি যেন প্রকৃতির বিকল্প হয়ে না ওঠে, বরং প্রকৃতিকে আরও নিবিড়ভাবে বোঝার একটি সহায়ক মাধ্যম হয়ে থাকে।

স্বপ্ন নয়, হয়ে উঠবে আগামী প্রজন্মের কাছে দেওয়া আমাদের প্রকৃত উত্তরাধিকার।

সুমনা গুপ্তা : গবেষক ও শিক্ষক, ইংরেজি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মতামত লেখকের নিজস্ব